জাপানের ভুঁড়ি আইন

মেটাবলিক সিন্ড্রোম- সরাসরি বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায়, বিপাকীয় লক্ষণ সন্নিপাত। চৌকষ বাংলা তবে সহজ কথায় বললে, বেশী খাওয়ার ফলে উদ্ভুত শারিরীক লক্ষণ সমূহ। বেশী খেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম যে শারিরীক লক্ষণ আমাদের মনে আসে, তা হলো একটা নাদুস নুদুস ভুঁড়ি। মেটাবলিক সিন্ড্রম এক অর্থে এই ভুঁড়িটির দিকেই আঙ্গুল দেখায়। অনেকে হয়তো ভাববেন, ভুঁড়ি একটা অত্যন্ত নিরীহ শারিরীক লক্ষণ, তা নিয়ে আবার এত কথা কিসের। জাপানে দীর্ঘ প্রবাস জীবনে আমি নিজেও এতদিন তাই মনে করে নিশ্চিন্তেই ছিলাম। বাদ সেধেছে এ দেশের আইন। সম্প্রতি জাপানে ভুঁড়ি গজানোর বিরুদ্ধে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ঘোষণা দেওয়া হয়েছে,কোন কোম্পানী যদি কর্মচারীদের (প্রবাসী কর্মচারী সহ) ভুঁড়ি বাগে না রাখতে পারে তা হলে সে কোম্পানীকে জরিমানা গুণতে হবে! খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান দায়িত্ব সেই অধিকার নিশ্চিত করা। দেশের মানুষ যদি খেতে না পায়, সেটা সরকারের ব্যর্থতা বলা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো, মানুষ যদি বেশী খেয়ে ভুঁড়ি গজায়, সেটা সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য হবে কিনা বা তার প্রতিকারে সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে কি না। জটিল প্রশ্ন, তাই প্রথমে এই ভুঁড়ি আইনের প্রেক্ষিত মেটাবলিক সিন্ড্রোম কি, সে প্রসঙ্গে আসি।

প্রাপ্ত বয়স্কদের মেটাবলিক সিনড্রোম নির্ণয়ের জন্য তিনটি গৌণ ও একটি মুখ্য মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ মানদন্ড তিনটি হচ্ছে, রক্তে কোলেস্টরল ও গ্লুকোজের উচ্চ পরিমাণ এবং উচ্চ রক্তচাপ। আর মুখ্য মানদন্ডটি হচ্ছে শারিরীক স্থূলতার সূচক হিসেবে মাপা পেটের বেড়। পেটের বেড় মাপার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশনের নির্ধারিত পরিমাপকে গ্রহণ করা হয়েছে, যা অবশ্য জাতি বিশেষে ভিন্ন। জাপানীদের জন্য, পেটের বেড় পুরুষের ৮৫ সেন্টিমিটার, নারীর ৯০ সেন্টিমিটার এর বেশী হলে, সেটা ভুঁড়ি (তবে বাংলাদেশিদের জন্য এই পরিমাপ হচ্ছে পুরুষের ৯০ সেন্টিমিটার, নারীর ৮৫ সেন্টিমিটার এর বেশী)। এই মানদন্ড অনুযায়ী সহজেই নির্ণয় করা যায়, কারো মেটাবলিক সিন্ড্রোম আছে কিনা। এই সিন্ড্রোম নিজে কোন সুনির্দিষ্ট রোগ নয়। তবে কারো যদি এই সিন্ড্রোম ধরা পড়ে তাহলে বুঝতে হবে, অদূর ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তির ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগে ভোগার সমূহ সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে মেটাবলিক সিন্ড্রোম কোন কোন ক্যান্সারের প্রকোপও বৃদ্ধি করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিষেধের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমান বিশ্বে, অসুখ হলে চিকিৎসা করানোর চেয়ে অসুখ যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সেই সুবাদে সারা পৃথিবীতেই বাচ্চাদের টিকা দেওয়ার প্রচলন হয়েছে। জাপানে এই মেটাবলিক সিন্ড্রোম (জাপানী ভাষায় সংক্ষেপে বলা হয়- মেতাবো), নির্ণয় করার প্রচেষ্টাও আগাম প্রতিষেধি পদক্ষেপের অংশ। আর মেটাবলিক সিন্ড্রোমের মুখ্য মানদন্ড যেহেতু পেটের বেড়, সে কারণেই ভুঁড়ি নিয়ে এত হৈ চৈ।

জাপানের ভুঁড়ি আইনে, ৪০ থেকে ৭০ বছর বয়েসী সকলকে প্রতি বছর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় শারিরীক স্থূলতার সূচক হিসেবে পেটের বেড় মাপাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোম্পানীগুলোকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকল কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শারিরীক অতি-স্থূলতা ২০১২ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১০ শতাংশ ও ২০১৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ কমাতে হবে, অপারগতায় কোম্পানীর আয়ের ১০ শতাংশ সরকারের বয়স্ক বিমা তহবিলে জরিমানা হিসাবে দিতে হবে। এই আইনের যৌক্তিকতার স্বপক্ষে পরিসংখ্যান হলো, গত দশ বছরে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কিনা ২০২০ সালে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। আর এই ব্যয় বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ মেটাবলিক সিন্ড্রোম, অর্থাৎ কিনা ভুঁড়ি গজানোর সাথে সম্পর্কিত রোগ সমূহের প্রাদুর্ভাব, যা আগেই উল্লেখ করেছি।

জাপানের বৃহত্তম কম্পিউটার প্রস্তুতকারী কোম্পানী এন ই সি জানিয়েছে, কর্মচারীরা এই নতুন আইনের শর্ত

পূরণ করতে ব্যর্থ হলে, কোম্পানীর জরিমানার পরিমান দাঁড়াতে পারে উনিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তা সত্ত্বেও কোম্পানীগুলো কিন্তু মেনে নিয়েছে এই আইন। তারা বিষয়টিকে দেখেছে কোম্পানীর উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে। এ সম্পর্কিত একটি গবেষণা তথ্য থেকে জানা যায়, মেটাবলিক সিন্ড্রোম মানুষের কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়। মেটাবলিক সিন্ড্রোম আছে এ রকম একজন ব্যক্তি বছরে ১৫ দিন অসুস্থতার অনুযোগ জানিয়েছে কর্মস্থলে, অপরদিকে মেটাবলিক সিন্ড্রোম নেই এরকম একজন ব্যক্তি অসুস্থতার অনুযোগ জানিয়েছে বছরে ১০ দিন। শুধু শারিরীক অসুস্থতা নয়, মানসিক অবসাদ, বিষাদ বা অন্যান্য মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও এ ধরণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। জাপানে এই পার্থক্য অনেক গুরুত্ব বহন করে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি জাপানে, কোম্পানীগুলো বেতন ভাল দেয় তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় কাজও করিয়ে নেয় অনেক বেশী। কাজ হয় যান্ত্রিক নিয়মে, যেখানে প্রত্যেকটি কর্মচারীর কাজ নির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে একজন কর্মচারীর অনুপস্থিতির কারণে কোম্পানীর সার্বিক কাজের ক্ষতির পরিমানও তুলনামূলকভাবে বেশী। জাপানে একজন কর্মচারী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে অফিস কামাই করলে সে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে মালিক বা সহকর্মীদের কাছে। যেন অসুস্থ হয়ে সে বিরাট কোন অপরাধ করে ফেলেছে। সে তুলনায় আমাদের দেশের সরকারী অফিসগুলোর কথা চিন্তা করলে মাঝে মাঝে ঈর্ষা বোধ হয়। বড় সাহেব জ্বরের কারণে অফিসে আসেন নি, ব্যস সাত খুন মাফ। তার টেবিলে কয়টা ফাইল আটকে গেল, কয়টা জরুরী মিটিং বাতিল হয়ে গেল, তার হিসাব করাটাও দোষণীয় হতে পারে। আর অসুস্থতার জন্য সহকর্মীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা- ব্যাপারটা ভাবা যায়?

জাপানে যখন ভুঁড়ি নিয়ে আইন পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে তখন আমাদের অবস্থা কি। অনেকে হয়ত বলবেন, যে দেশে অর্ধেকের বেশী মানুষ অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছে সে দেশে ভুঁড়ি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আছে নাকি, ওটাতো বিত্তবানদের সমস্যা। বক্তব্যের প্রথম অংশ সত্য, তবে শেষ অংশ নিয়ে কিছু কথা আছে। ভুঁড়ি কি আসলে বিত্তবানদের সমস্যা? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সে দেশে দিন এনে দিন খায় এ রকম নিম্নবিত্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি, যাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী হচ্ছে মোটা অর্থাৎ ভুঁড়ীওয়ালা মানুষ। কারণ, সে দেশে উচ্চবিত্তরা বাজার থেকে যে দামী খাবার কেনে, তা তৈরী করা হয় ক্যালোরী ও পুষ্টির অংক কষে। অপরদিকে নিম্নবিত্তের জন্য বাজারের সস্তা খাবার, বা জাঙ্ক ফুডের বিবেচেনা হচ্ছে খেয়ে দ্রুত পেট ভরছে কিনা সেটা। এ সব জাঙ্ক ফুডে প্রচুর ফ্যাট থাকে, ফলে নিম্নবিত্তরা ক্রমাগত এসব সস্তা খাবার খেয়ে দ্রুত মুটিয়ে যায়। জাপানে মেটাবলিক সিন্ড্রোম নিয়ে মাথাব্যাথার মূলেও রয়েছে কিন্তু এই জাঙ্ক ফুড। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট হয়তো ভিন্ন, যেহেতু জাঙ্ক ফুডের তেমন প্রচলন নেই। তবে খাবার নিয়ে কথা আছে। একসময়ের মাছে-ভাতে বাঙালীরা বর্তমানে খাচ্ছে কি। মাছ নেই, যাও বা আছে তাতে দেওয়া হচ্ছে ফর্মালিন। অর্থাৎ মাছ কেনার সামর্থ নেই বা সামর্থ থাকলেও মাছ খাওয়ার ইচ্ছা নেই সাধারণ মানুষের। এর একটা বিকল্প হতে পারতো সী-ফুড, যেমন সামুদ্রিক শামুক, অক্টোপাস বা বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী। সেটা হয়নি। আমাদের নির্ভরতা বেড়েছে ব্রয়লার মুরগী আর সীমান্তের ওপার থেকে আসা গরুর উপরে। এগুলো কিন্তু জাঙ্ক ফুডেরও প্রধান উপাদ্য। আমার এক জাপানী ব্যবসায়ী বন্ধু কথাচ্ছলে বলেছিলো, সে শুনেছে ভারত থেকে গরু আসার কারণে বাংলাদেশে নাকি গরুর মাংস খুবই সস্তা। তার প্রশ্ন ছিলো, বাংলাদেশ থেকে ভারতে কি যায়। আমি সংক্ষিপ্ত জবাবে বলেছিলাম, হার্টের রুগী। দারুন ব্যবসা, ঠাট্টা করছি ভেবে হাসতে হাসতে বলেছিলো সে। আসলে কি ঠাট্টা? আমাদের দেশে গরীবের ভুঁড়ি নেই মানি, মধ্যবিত্তের চেহারাটা কিন্তু ভুঁড়ি ছাড়া ভাবা দুষ্কর। মধ্যবিত্তের ভাল থাকা মানে, ভাল খাওয়া। মধ্যবিত্তের ভালবাসা মানে, ভাল খাওয়ানো। আর সেই ভাল খাবারের অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে স্নেহ পদার্থ অর্থাৎ কিনা ফ্যাট। ভুঁড়ি শুধু আমাদের পেটে নয়, ভুঁড়ি রয়েছে আমাদের কালচারে।

শুরুর সেই জটিল প্রশ্নে ফিরি। ভুঁড়ি গজানোর বিরুদ্ধে প্রণীত আইন গণতান্ত্রিক কি না। সত্যি বলতে, উত্তরটা আমার জানা নেই। তবে, জাপানের এই ভুঁড়ি আইনের খবর পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগলোর সংবাদ মাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশিত হয়ছে । সেই সাথে মন্তব্যে বলা হয়েছে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এ রকম আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

গণতন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয় ব্যক্তির অধিকার। পাশ্চাত্য দেশগুলো ব্যক্তির অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও সোচ্চার। সেই সচেতনতা, মত প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজের কথা বলার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে তবে অন্যের কথা শোনাকে বাধ্যতামূলক করেনি। নিজেকে উন্মোচন করার স্বাধীনতা দিয়েছে, তবে সেই নগ্নতায় অন্যের বিব্রত হবার অবকাশ তেমন রাখেনি। নিজের ফ্রিজে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী খাবার মজুদ করে সপ্তাহ শেষে তা ফেলে দেবার স্বাধীনতা দিয়েছে, পার্কের হোমলেস অনাহারী লোকটিকে তাতে বাধা দেওয়ার অধিকার দেয়নি। ভোজন বিলাসিতা বা সে কারণে ভুঁড়ি গজানো; পাশ্চাত্যে এগুলো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, এ নিয়ে অন্যের কথা বলা আইন সঙ্গত না হওয়াটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে এই ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্রম বিশ্বায়ন ঘটলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝে মূল্যবোধের পার্থক্য এখনো বিদ্যমান। প্রাচ্যের রয়েছে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার কালোত্তির্ণ ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের অন্যতম বাহক সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের এই ভুঁড়ি আইন, সমষ্টির ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে প্রণীত (ব্যক্তির মঙ্গল বিবেচনা করেই), তা বলা যায়। সমস্যা আসলে আমাদের নিয়ে। যে ভুখন্ড থেকে পুবের সূর্যোদয়ের দিকে তাকানো সহজতর ছিলো, শত বছরের পাশ্চাত্য আগ্রাসনে জর্জরিত সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা দূর পশ্চিমের সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় আমাদের হয়তো এ রকম ভুঁড়ি আইন অপ্রয়োজনীয়। তবে বাংলাদেশে যারা সমষ্টির জন্য আইন প্রণয়ন করেন ও তা বাস্তবায়ন করেন, অর্থাৎ রাজনীতিবিদ ও সরকারী আমলাদের জন্য এ ধরণের আইন প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ, যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পেট পুরে খেতে পায় না, সে দেশের জনপ্রতিনিধিরা ভুঁড়ি গজাতে পারেন না। সেই সাথে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা জুড়ে দিতে চাই। যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, সে দেশের জনপ্রতিনিধিরা নিজের এবং পরিবার-পরিজনের উন্নত চিকিৎসার জন্য হুট করে বিদেশে পাড়ি জমাতে পারেন না। এ ব্যাপারেও সুনির্দিষ্ট আইন তৈরী করা দরকার। বরং সেই আইনই বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার করুণ চিত্রটিকে দ্রুত পালটে দিতে পারে।

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান
জাপান প্রবাসী গবেষক ও চিকিৎসক
sheikhaleemuzzaman@yahoo.com